Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 351–358
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

সৈকত রক্ষিতের সাহিত্যে নারীর অসহায়তা

ড. বিশ্বজিৎ মণ্ডল
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়
ইমেল : mandal.biswajit87@gmail.com

Keyword
অন্ত্যজ, জীবণাচরণ, অবহেলিত, কর্মসঙ্গিনী, ভেকধারী, ডাইনি, নাচনী, বিশ্বাস-সংস্কার, রাধা-কৃষ্ণ।

Abstract
পুরুলিয়ার ভূমিপুত্র, সমাজ সচেতন সৈকত রক্ষিতের লেখালেখি মূলত প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে। প্রান্তিক পুরুলিয়া এবং পুরুলিয়ার অন্ত্যজ মানুষেরা; কুর্মি-হাঁড়ি-শবর-বাউরি-সাঁওতাল-ভূমিজ-মুচি-মাহাতো-ডোম শ্রেণির মানুষই তাঁর লেখার সম্পদ। মফস্বল শহর, গ্রাম ও গ্রামজীবন; ব্যক্তিজীবন অপেক্ষা গোষ্ঠীজীবন তাঁর লেখার মূল আলোচ্য। বাঁচার লড়াইয়ে হেরে যাওয়া, খেটে খাওয়া, হতদরিদ্র মানুষজনের প্রকৃত মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে তাঁর কলমের আঁচড়ে। সৈকত রক্ষিত তাঁর লেখায় যেসব নিম্নবিত্ত তথা বিত্তহীন মানুষদের কথা বলেছেন তারা নানা বর্ণ ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে চিহ্নিত হলেও তাদের মধ্যে একটা অর্থনৈতিক অবস্থানগত ঐক্য আছে; সবারই প্রধান অসুখ দারিদ্র্য, এ দারিদ্র্য আবার সারারও নয়। লেখকের চেনা-জানার ব্যপ্তিই এই সমস্ত সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন। লেখালেখি তাঁর কাছে আত্মপ্রচার ও আত্মতুষ্টি নয়; আত্ম-অহংকার বর্জিত সম্পূর্ণতই এক নিভৃত সারস্বত সাধনা, সেই সাধনাতেই তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত।

সময়ের পথ ধরে তাঁর কথনবিশ্বে উঠে এসেছে প্রান্তিক জনজীবনের নিভৃত আদল, অতি সাধারণ নারী-পুরুষের কথাই উঠে এসেছে তাঁর সাহিত্যের অঙ্গনে। সীমাহীন দারিদ্র্য এবং প্রথাগত শিক্ষা-দীক্ষাহীন প্রান্তিক মানুষগুলি অন্তরের নির্দেশে উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও ধর্ম-অধর্মের ধারণা থেকে অসহায় জীবন-যাপন করে চলেছে। আখ্যানে পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি নারী চরিত্রগুলিও বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। তাঁর গল্পের নারী চরিত্রেরা কখনো প্রতিবাদী, কখনো প্রেমিকা, কখনোবা আবার জায়া ও জননী। তবে যেভাবেই উপস্থাপিত হোক না কেন তাদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে বেশি প্রকট সেটি হলো অসহায়তা। প্রান্তিক নারীর এই অসহায়তা সবদিক থেকেই, সামগ্রিক জীবণাচরণে তার প্রতিফলন সবচেয়ে সুস্পষ্ট। ডাইনি প্রথাকে হাতিয়ার করে নারীর নির্মম অসহায়তা, বাঁঝা হওয়ার কারণে ভেকধারী ভণ্ড সাধুদের প্রতাড়নার স্বীকার হওয়া, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমমঞ্জরীর অনুসঙ্গে লোকায়ত নারীর কামন-বাসনার বহিঃপ্রকাশ, সর্বোপরি হরেককিসিমের বিশ্বাস-সংস্কারের আধার হয়ে নারীরাই সমাজে নির্যাতিতা। তবুও তাঁর সাহিত্যে পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি নারীর অবস্থানও সমানভাবে সক্রিয়; তবে কর্মসঙ্গিনীতো বটেই, মোটেই মর্মসঙ্গিনী নয়। নারীরা সেখানে অবহেলিত, শোষিত ও বঞ্চিত। তাদের এই অসহায়তা যেমন নিজের দিক থেকে তেমনি আবার সামগ্রিকও।

প্রখর বাস্তববাদী, মানবদরদী লেখক শব্দের ছবিতে নিচুতলার মানুষদের চিত্রায়িত করতে ভালোবাসতেন, করেছেনও তাই। মানুষের কাছে যাওয়াই ছিল তাঁর প্রিয় সখ। সেটা করতে গিয়ে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল বা দলিলের প্রতি তিনি দাসখত লিখে দেননি। তাঁর একমাত্র অঙ্গীকার মানুষগুলির প্রতি। সেই মানুষগুলি, যাঁদের কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন, সংসারে 'যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছু, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনো হিসাব নিলে না...', এই প্রান্তিক, বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষগুলির চরিত্র সুনির্দিষ্ট আবেগ অনুভূতির সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর কথনবিশ্বে। সেদিক থেকে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল, নারী চরিত্রগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রান্তিক অসহায় নারীর যে চালচিত্র তিনি তাঁর সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন তা অত্যন্ত অভিনব ও বিশেষ তাৎপর্যের দাবি রাখে, গল্পকারের মানবিকতার উত্তুঙ্গ স্পর্শে তারা চিরকালীন।

Discussion

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের বিষয়গত ও প্রকরণগত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে উত্তর ঔপনিবেশিক আখ্যানে যেখানে প্রান্তিক মানুষের নিরুদ্ধ স্বর উচ্চারিত হচ্ছিল; সেখানে বাংলা সাহিত্যেও তার আঁচ পাওয়া অসম্ভব নয়। ছয়-সাতের দশক ও তার পরবর্তী সময়ের লেখকরা শহুরে শিক্ষিত হলেও তাঁরা মুখ ফিরিয়েছেন প্রত্যন্ত গ্রামবাংলায়। কর্মসূত্রেই হোক বা অভিজ্ঞতাসূত্রে, তাঁরা দরদ দিয়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক মানুষের শোষণ-যন্ত্রণার পাশাপাশি তাদের কৌম সংস্কৃতি, পরিবর্তিত সময়ের প্রতিচ্ছবি সবকিছুই প্রবল গতিতে সাহিত্যে তুলে এনেছেন। সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, অভিজিৎ সেন, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সৈকত রক্ষিত, সমীর রক্ষিত, নলিনী বেরা, অনিল ঘড়াই প্রমুখ যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন অন্তেবাসী মানুষের বেদনা; তারাই সময়ের প্রত্যাশিত ফসলকেই সাহিত্যে তুলে এনেছেন আপন সন্তানস্নেহে। তবে প্রথমেই যাঁর কথা উল্লেখ না করলে বাংলা সাহিত্যের এই নতুন অভিমুখ সঞ্চারের ইতিহাসই অসম্পূর্ণ থেকে যায় তিনি হলেন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর লেখনি ভানুমতীর সেই অজ্ঞাত ভারত কথাকেই দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

পুরুলিয়ার ভূমিপুত্র সৈকত রক্ষিতের লেখালেখি মূলত প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে। প্রান্তিক পুরুলিয়া এবং পুরুলিয়ার অন্ত্যজ মানুষেরা; কুর্মি-হাঁড়ি-শবর-বাউরি-সাঁওতাল-ভূমিজ-মুচি-মাহাতো-ডোম শ্রেণির মানুষই তাঁর লেখার সম্পদ। মফস্বল শহর, গ্রাম ও গ্রামজীবন; ব্যক্তিজীবন অপেক্ষা গোষ্ঠীজীবন তাঁর লেখার মূল সম্পদ। বাঁচার লড়াইয়ে হেরে যাওয়া, খেটে খাওয়া, হতদরিদ্র মানুষজনের প্রকৃত মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে তাঁর কলমের আঁচড়ে। সৈকত রক্ষিত তাঁর লেখায় যেসব নিম্নবিত্ত তথা বিত্তহীন মানুষদের কথা বলেছেন তারা নানা বর্ণ ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে চিহ্নিত হলেও তাদের মধ্যে একটা অর্থনৈতিক অবস্থানগত ঐক্য আছে; সবারই প্রধান অসুখ দারিদ্র্য, এ দারিদ্র্য আবার সারারও নয়। লেখকের চেনা-জানার ব্যপ্তিই এই সমস্ত সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন। লেখালেখি তাঁর কাছে আত্মপ্রচার ও আত্মতুষ্টি নয়; আত্ম-অহংকার বর্জিত সম্পূর্ণতই এক নিভৃত সারস্বত সাধনা, সেই সাধনাতেই তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত।

সময়ের পথ ধরে তাঁর কথনবিশ্বে উঠে এসেছে প্রান্তিক জনজীবনের নিভৃত আদল, অতি সাধারণ নারী-পুরুষের কথাই উঠে এসেছে তাঁর সাহিত্যের অঙ্গনে। সীমাহীন দারিদ্র্য এবং প্রথাগত শিক্ষা-দীক্ষাহীন প্রান্তিক মানুষগুলি অন্তরের নির্দেশে উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও ধর্ম-অধর্মের ধারণা থেকে অসহায় জীবন-যাপন করে চলেছে। আখ্যানে পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি নারী চরিত্রগুলিও বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। তাঁর গল্পের নারী চরিত্রেরা কখনো প্রতিবাদী, কখনো প্রেমিকা, কখনোবা আবার জায়া ও জননী। তবে যেভাবেই উপস্থাপিত হোক না কেন তাদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে বেশি প্রকট সেটি হলো অসহায়তা। তাঁর সাহিত্যে পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি নারীর অবস্থানও সমানভাবে সক্রিয়; তবে কর্মসঙ্গিনীতো বটেই, মোটেই মর্মসঙ্গিনী নয়। নারীরা সেখানে অবহেলিত, শোষিত ও বঞ্চিত। তাদের এই অসহায়তা যেমন নিজের দিক থেকে তেমনি আবার সামগ্রিকও। কথাকার সৈকত রক্ষিত তাঁর সাহিত্যে প্রান্তিক নারীর হৃদয়হীন অসহায়তা কিভাবে কাহিনিপটে চিত্রায়িত করেছেন সেই তত্ত্বতালাশের প্রয়াসই আলোচনার মূল লক্ষ্য।

সৈকত রক্ষিতের সামগ্রিক সাহিত্যে নারীর অবস্থান পর্যালোচনা করলে সেখানে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য অবলীলায় আমাদের সামনে চলে আছে। সেগুলি নিম্নরূপ :

নারীরা পুরুষের অবহেলার স্বীকার–

আদিবাসী মানুষগুলির জনজীবনের কথা বলতে গেলে প্রথমেই চলে আসে তাদের আনাড়িপনার কথা। কোন একার পক্ষে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা জোটবদ্ধ যৌথজীবন-যাপনে বিশ্বাসী, তাদের জীবনাচরণও অনেক কদর্য। অপবাদের দিক থেকে প্রথমত নারীরাই তাদের অত্যাচারের শিকার। কোন নারী সন্তানসম্ভবা হতে না পারলে তার অপমানের সীমা-পরিসীমা থাকে না, তেমনি কোন গৃহবধূ সুন্দরী হলে পড়শীরা তার যৌন হয়রানী করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। 'ধূলা উড়ানি' উপন্যাসের নায়িকা সুন্দরী ভাদরীকে তার সেই শৈশব থেকে যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। সাঁওতাল সমাজের মেয়েদের জীবন নানারকম বিধি-নিষেধে আবদ্ধ, নিজ সমাজের বাইরের কোন কিছুকেই তারা সহজে মেনে নিতে পারে না। বিবাহতো অনেক দূরের কথা! মাত্র ষোল বছর বয়সে সমাজের রক্তচক্ষু শাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, জীবনকে পুরোমাত্রায় উপভোগ করার জন্য ভাদরী ঘর ছেড়েছিল একান্তই মনের মানুষের সঙ্গে। ভ্রুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি গোঁফ থাকলেই পুরুষ হয় না, তার মনের মানুষ মনহর একজন মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ। প্রিয়াকে নিজের বাহুডোরে রাখার কোন ক্ষমতাই তার নেই। কাজেই, নিয়তির ফেরে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে সে হয়ে যায় মনহরদের গ্রামীণ সমাজের মোড়ল-মাতব্বরদের সম্পত্তি এবং ঘৃণ্য নাচনী জীবনের স্বীকার। এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষে বদল হয় তার মালিকানা। কালের গতিকে, পুরুষের অবহেলার স্বীকার হতে হতে সে ঘৃণ্য নাচনী থেকে হয়ে ওঠে অভিশপ্ত ডাইনি। গ্রামের অন্ধকুসংস্কারাছন্ন মানুষজন ডাইনি বলে শাস্তি দিতে চেয়েছে রবণকে কিন্তু রবণ তা মেনে না নিয়ে গ্রাম থেকে পালিয়ে গিয়ে সে শাস্তি এড়াতে চেয়েছে কিংবা আবারো কোন অজানা স্রোতে ভেসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেননা সে নিজেকে ডাইনি বলে বিশ্বাসই করে না,

> "... আর করে না বলেই তো এই চলে যাওয়া তার কাছে পলায়ন নয়। তাদের সামষ্টিক আরোপের বিরুদ্ধে তার একক প্রতিবাদ।"[১]

তাইতো ষোল বছরে যে সমাজের রক্তচক্ষু শাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছিল, তারপর জীবনের চোদ্দ বছর সে শুধুই হেরেছে, আর এই তিরিশ বছরে সে আর হারতে চাইনি; সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে যখন ডাইনিই তখন ঘাটে-মাঠে-জঙ্গলে-বনে-বাদারে-শ্মশানে-মশানে যেখানে খুশি সে থেকে যাবে।

নারীরা পুরুষের কর্মসঙ্গিনী, মর্মসঙ্গিনী নয়–

'কুশকরাত' উপন্যাসের মুখ্য আলোচ্য হাটগ্রামের শাঁখারি সম্প্রদায়। প্রত্যেক শাঁখচির তাদের ছোট্ট ঘিঞ্জি মাটির একচিলতে ঘুপচি ঘরেই দিনব্যাপী তিনপুয়া জায়গার মধ্যে বসেই নিবিড় মননে নিজস্ব শিল্পকর্ম করে চলে। সামান্য বিরাম দেওয়ার ফুরসতও তারা পায় না, এমনকি কাজের জন্য দীর্ঘক্ষণ তারা তলপেটে 'প্যাসসাব'ও চেপে রাখে। তবে তারা এই কাজ করে বিশেষ কিছু আশা করে না, কোন মতেই জীবনটা নির্বাহ হলেই খুশি,

> "শুধু বেঁচে থাকাটুকু ছাড়া জীবনের কাছে তাদের আর কোনও দাবি নাই। এদের পর্যাপ্ত আহার নেই, বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই, আহ্লাদ-আনন্দ-হর্ষ নেই, কেবল জীবনটুকুই আছে।"[২]

জীবন-জীবিকা নির্বাহের এই খেলায় বাড়ির নারীরাও পুরুষের সঙ্গে সমানে হেঁসেলের কাজ সামলে সাধ্যমত শাঁখের কাজ করে থাকে। শাঁখের কাজে কোন লিঙ্গ ভেদ নেই, ভেদ শুধু এক জায়গায়; শাঁখচিরদের বেলায়। মেয়েরা যোগ্য শাঁখচির হতে পারে না, সেটা ভারী কাজ। 'মহামাস' উপন্যাসে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত লক্ষ তৈরির কাজ করে জীবন নির্বাহ অসম্ভব হয়ে পড়লে পরিবারের কেউ কেউ বিশেষ করে বউ আর বাচ্চারা মিলে ঠোঙা তৈরি না হলে সুপারি কুচানোর কাজ করে থাকে। সবাই আবার করে না, যারা করে তারাও লক্ষর কাজ থাকলে আগে সেটাকেই করে বাকি সময়টা একাজ করে থাকে। 'হাড়িক' উপন্যাসে হাড়ি পাড়ার মেয়েরা মূলত ধাইয়ালির কাজ করলেও যখন তা না পায় তখন পুরুষদের

সঙ্গে বাইরে কাজ করতে যেতে কোন দ্বিধা করে না। প্রত্যেক হাড়ি বউয়ের দু-তিনটি করে গ্রাম নির্দিষ্ট আছে। তবে সবসময় তো আর ধাইয়ের কাজে ডাক আসে না, তখন তারা পুরুষের সঙ্গে মুনিশ খাটতে বেড়িয়ে যায়। বাঁধ কাটা, কুয়ো খোড়া কিংবা পথ-ঘাট সংস্কারের কাজ করতে তারা পুরুষের সমান পারদর্শী। এমনকি যুবতী মেয়েদের শাড়ির তলে ব্লাউজ না থাকলেও কোন সংকোচ বোধ করে না। তবে হাসপাতাল হয়ে যাওয়ায় এখন ধাইয়ের কাজ অনেক কমে গেছে,

> "হাসপাতাল হঁয়ে গেছে য্যাথা-স্যাথা। নাস মাইঞা লাড়ি ছেদ করছে। ধাইয়ের কি দরকার তাবাদে ধরুণ দুটা-তিনটি খালাস করার পর উপারস্যান! গরমেটও বলছে উপারস্যান করালে টাকা পাবে। ত সেই লোভে ভখা মানুইষ উপারস্যান করাছে। ... তাথে হামরা আরই কর্মছাড়া হয়ে গেছে।"[৩]

'কসাই' গল্পে হিমানি পার্শ্ববর্তী মাঠ থেকে গোবর কুড়িয়ে নিয়ে এসে ঘুঁটে দেয়, সময়ে অসময়ে তা বিক্রি করে কিছু রুজি-রোজগারের ধান্দা করে থাকে সে। 'মাড়াই কল' গল্পে কুঞ্জ চাষের মালিক হলেও চাষের সমস্ত কাজই করতে হয় চেপুলালকে। শুধু চেপুলাল না, স্ত্রী ভাবনি ও ছেলে হীরালালও কুঞ্জর সর্বসময়ের রাখাদার। 'খেমটি' গল্পে যমুনা নাচনীকে আশ্রয় করে যেমন নাচনী সমাজের প্রকৃত সাংস্কৃতিক বলয়টিকে উন্মোচন করেছেন তেমনি হাতিরামকে ঢাল করে ভেড়ুয়া বা রসিক সমাজকেই চিত্রিত করেছেন। 'আঁকশি' গল্পে মাগারামের সঙ্গে স্ত্রী বেদেনী সহ তার পুরো পরিবার শিমূলের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। 'দাহভূমি', 'খাদান', 'ধমন', 'মুলুন' প্রভৃতি গল্পে নদীখাতের বালী থেকে স্বর্ণরেণু সংগ্রহ, পাথর ভেঙে পাথরকুচি তৈরির বৃত্তি, ভ্রাম্যমান স্বর্ণকার ও পদ্মের নাল সংগ্রহ করতে স্বপরিবারে ঘুরে বেড়ায়।

দিনভর কাজ করে কী হচ্ছে সেটার থেকে কাজটা করে যাওয়াই তাদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা, বিনিময়ে দিনশেষে একটুতো খাবার জোটে! তাই সহায়-সম্বলহীন পুরুষরা নারীর মনের ও শরীরের রোগ-শোক, জ্বরা-ব্যাধির কোন খবরাখবরই রাখে না, রাখতে চায়ও না। কারোর শরীর খারাপ হলে কিংবা গুরুতর অসুখেও তারা কপালকে একরকম বিশ্বাস করেই বসে থাকে। ডাক্তার ডাকাতো দূরের কথা, কোবরেজ-গুনিনও তারা অনেকসময় ডেকে উঠতে পারে না। অবশ্য সেখানে পারকতারও একটা ব্যপার আছে! একরকম বিনা চিকিৎসায়, বিনা সেবায় তাদের প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুও তারা মুখ বুজে মেনে নিতে একপ্রকার বাধ্যই হয়।

সমাজের ভেকধারী ভণ্ড সাধুদের প্রতাড়নার স্বীকার–

আদিবাসী সমাজে নানান কারণে অনেক বধূ নিঃসন্তান থেকে যায়, মূল সমস্যা কার সেটা বিচার্য বিষয়। বিয়ের এক বছর প্রতি রাতে মরদের সঙ্গে শুয়েও কোন নারী সন্তানসম্ভবা না হতে পারলে সাবেকি ধারণায় নারীকেই বাঁঝা প্রতিপন্ন করে নিরন্তর সমাজ-সংসার পরিবার-পরিজন থেকে একঘরে করে দেয়। 'সিঁদূরে কাজলে' উপন্যাসে ভাদরি, 'কুশকরাত' উপন্যাসে তরু সেই বাঁঝা মেয়েমানুষ; যা তাদের কাছে একপ্রকার অসহনীয়। কুসংস্কারাছন্ন সমাজে গুণকারী, ভেকধারী সাধুরা নারীর এই নির্মম অসহায়তার সুযোগ নিয়ে নির্বিকারভাবে তাদের অপকর্ম চালিয়ে যায় বছরের পর বছর ধরে। সবাই সব কিছু জানে কিন্তু অনেক সময় কিছুই করার থাকে না। গ্রামের অনেকের মতো তরুরও সাধুটির উপর ছিল প্রবল অবিশ্বাস। তবুও আরতী কালীর কথায় তরু তার কাছে গিয়েছিল, যেতে একপ্রকার বাধ্যই হয়েছিল। ভেবেছিল, বাঁঝাবউ হয়ে জীবন কাটানোর চেয়ে সাধুর কলঙ্ক মাথায় বয়ে বেড়ানো ঢের ভালো; ললাটে সাধুর কলঙ্ক নিয়ে আজ সে সন্তানসম্ভবা। তরুর মতো গ্রামের আরো অনেকে অপমানের হাত থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে, বাঁঝা কলঙ্ক ঘোঁচাতে সাধুর কলঙ্ক জীবনভর বয়ে বেড়াতে এককথায় রাজী।

সাহিত্যেও হয় ভোগ্যা, না হলে অযোগ্যা করেই নির্মাণ–

'নাচনী' নাটকে বাঁশি চরিত্রের মুখ দিয়ে কথাকার নিজেই বলিয়েছেন– 'শাস্তরে বলেছে, মাঞা মানুষের সৃষ্টিয়েই হয়েছে পরের লাইগে। মানে মরদের লাইগে'। পুরুষশাসিত সমাজ এখনো নারীকে ভোগ্যা রূপেই দেখতে চায়। তার কারণ, সমাজে কোথাও প্রেম-সহমর্মিতা-সহানুভূতির পরিমণ্ডল গড়ে উঠছে না। সর্বত্র হিংসা ও দুর্নীতি। কোথাও কোন প্রতিবাদের জায়গা থাকছে না। বানিজ্য সংস্থাগুলি তাদের প্রোডাক্ট বিক্রির জন্য নারীকেই সাজিয়ে-গুজিয়ে দেখাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায়

নারী পুরুষকে ডাকছে। সারা দুনিয়া জুড়ে চলছে সেক্স এবং নারীচর্চা। আর এইসব কারণে শুধু যে পুরুষই উতলা হয়ে উঠছে তা নয়, নারীও সমানে বহির্মুখী। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক তৃষ্ণা। ফলে প্রেম টিকছে না, উপরন্তু সংসারও ভেঙে যাচ্ছে। এই নাগরিক পরিস্থিতি এখন নগর ছেড়ে গ্রামগুলিকেও সংক্রমিত করছে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সফল অস্ত্র ফেসবুক, হোয়াটস্অ্যাপ, টুইটার প্রভৃতির দৌলতে নগরগুলির সঙ্গে গ্রামগুলির আধুনিকীকরণের ফলে গ্রামগুলিতেও নারীরাই হয়ে উঠছে চর্চার বিষয়বস্তু। তারা হয়ে উঠছে সমানে বহির্মুখী, নিজেরা একান্তই সমাজ-সংসার, পরিবার-পরিজন ছেড়ে বেড়িয়ে আসতে চাইছে। পা মেলাতে চাইছে পুরুষের সঙ্গে সমানে সমানে, আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার অলিতে-গলিতে।

ডাইনি প্রথাকে হাতিয়ার করে নারীর নির্মম অসহায়তা–

বিস্তীর্ণ পুরুলিয়ার আদিবাসী গ্রামগুলিতে গ্রীষ্মের দিনগুলিতে প্রচণ্ড জলাভাবে খরার সৃষ্টি হলে লোকায়ত মানুষগুলোর সেই অর্থে কোন কাজবাজ থাকে না। দিনভর শুয়ে-বসে, খেয়ে-না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে দিন অতিবাহিত করে দেয়। মানুষের এই নির্মম অসহায়তার দিনে যাদের হাতে একটু পয়সা আছে তারাই ডাইনি প্রথাকে হাতিয়ার করে মারাত্মক খেলায় মেতে ওঠে। ডাইনি প্রথায় নারীই যে মূল লক্ষ্য তা কিন্তু নয়। লক্ষ্য হল হত্যা, লুণ্ঠন, কখনোবা প্রতিশোধ। দেখে দেখে গ্রামের অসহায় মানুষেরাই এর স্বীকার হয়। একই উদ্দেশ্যে পুরুষকেও ডাইনি করা হয়ে থাকে। নিরক্ষর আদিবাসী মানুষগুলো সহজে কোনভাবেই এর থেকে নিস্তার পায় না,

> "তারা আজও জানে না যে সত্যিকারের ডাইনি বলে কিছু নেই, ডাইনি মানুষের সৃষ্টি।"[৪]

তবে পুলিশ-প্রশাসনের তৎপরতা, অত্যাচারীদের সাবধান করা ও চেতনামূলক দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলে অপরাধ একটু কমতে পারে। মাঝে-মধ্যে ফিল্ম-ডিভিশনের ছবি দেখানোরও উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

আজকের উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যায় দাঁড়িয়েও নারীর হরেকরকম বিশ্বাস-সংস্কার–

সৈকত রক্ষিতের কথাসাহিত্যে সেই সব মানুষ ও মানুষের জীবন উঠে এসেছে যাদের সঙ্গে সমাজের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সম্পর্ক ক্ষীণ, যুগের তালে তাল মিলিয়ে চলতে যারা অপারগ। কাজেই তাঁর সাহিত্য হয়ে উঠেছে আদ্যন্ত আচার-বিশ্বাসের সূতিকাগার। আচার-বিশ্বাস-সংস্কার লোকায়ত সংস্কৃতির অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে আছে। পুরুলিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে যারা বসবাস করে; বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায় সাঁওতাল, লোধা, ওরাও, ভূমিজ, খাড়িয়া, বাইদ্যা তাদের জীবন আদ্যন্ত বিশ্বাস-সংস্কারে ভরপুর। অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস এবং ভয়ভীতি সদা-সর্বদা বিশ্বাস-সংস্কারের মূল প্রেরণা হয়ে থাকে। বিশ্বাস সংস্কারের ডানায় ভর করে তাদের কাছে এসে পড়ে নানারকম আদেশ, উপদেশ, স্বপ্নাদেশ। কারোর সন্তান না হলে ওঝার কাছে যাওয়া, মন্ত্র-তন্ত্র জাদু শক্তিতে সন্তান লাভ করা, কারের শরীর খারাপ করলে মন্ত্র-তন্ত্র ঝাঁড়ফুকের উপর নির্ভরশীলতা, গ্রামে ফসল ভাল না হলে কিংবা গ্রামের কেউ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে ডাইন-ভূতে বিশ্বাস করতে শুরু করা, বিভিন্ন দেবতা-অপদেবতায় বিশ্বাস, পাহাড়-টিলা-ডুংরীকে কেন্দ্র করে লৌকিক, অতিলৌকিক বিশ্বাস, তিথি, নক্ষত্র, বার, গণ অনুযায়ী নানান গুপ্তবিদ্যার প্রয়োগ, বাটি পড়া, চাল পড়া, ধুনো বাণ, সরষে বাণ এসবের প্রচলন দেখা যায়।

রোহিণীর দিনে তারা মাটি পুজো করে সেই থানের মাটিকে ঘরে তুলে রাখে। শুয়োরকে খাসি করতে গিয়ে রক্তপাত শুরু হলে সেই থানের মাটিকে রক্তক্ষরণ রোধ করতে তারা কাজে লাগায়। বিষম সরেণ ধনুকে বরা বাঁধতে গিয়ে গুহিরামের ছেলে নন্দলালকে বিঁধে ফেললে যখন অঝোর ধারায় রক্ত বেরোতে থাকে তখনও তারা সেই থানের মাটি রক্তক্ষরণ রোধ করতে ব্যবহার করে। বিয়ের অষ্টমঙ্গলা পেরোতে না পেরোতেই শ্বাশুড়ী মারা গেলে সে বউ 'কুলক্ষণা বউ' ছাড়া আর কি হতে পারে! তারা এতটাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে, সোমত্ত মেয়ে রাধারাণীকে বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিবস্ত্র ও মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলে কোন কিছু না ভেবেই বিনম্র চিত্তে লোকবিশ্বাস-সংস্কারে বুলানা ভূতের কাণ্ড বলেই বিশ্বাস করে নেয়। গর্ভবতী বউরা সন্ধের আগে বাড়ির বাইরেও যেতে ভয় পায়, কেননা,

> "ঠিক অন্ধকার ঢেকে ফেলার আগের যে থমথমানি এটাই সবচেয়ে ভয়ের। তরু মনে করে এইসময় যে হাওয়াটা বয় সে হাওয়া নাকি দূষিত, অলৌকিক।"[৫]

এমনকি কোন পুকুরে যদি পরপর দুবছর কোন ছেলে ডুবে মারা যায়, তারা ভেবে নেয় প্রতি বছরই পুকুরটি কাউকে না কাউকে নেবে। এরকমই হাজারো বিশ্বাস-সংস্কার লোকায়ত মানুষগুলিকে আস্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে, আর মানুষগুলি অবলীলায় গোষ্ঠীজীবনের চিরন্তন বিশ্বাস-সংস্কারের তন্তুজালে জড়িয়ে ধুকে ধুকে মরছে।

দুঃখের সংসারে বিটি বড় কষ্টের, বড় সমস্যার–

দুঃখের সংসারে বিটি বড় হয়ে বিয়ের বয়সি হলেই তারা পড়ে কঠিন সমস্যায়। উপরন্তু রয়েছে বিবাহ পরবর্তী নানান সমস্যা। বিটির বিয়ে দেওয়া মানে বিনা বেতনে কামিন খাটতে পাঠিয়ে দেওয়া। মেয়েকে বিয়ে দিয়ে বাপের লোকচক্ষুর আবডালে কাঁদা ছাড়া কোন উপায় থাকে না; কারণ শাগ-বাইগন-তরকারির পারা মেয়েকে সে ব্যাপারির কাছে বিকে দিয়েছে। শ্বশুরঘরে স্বামী বিনে আপন কারোর অভাবে মেয়ের চোখের জলই একমাত্র নিরন্তর সঙ্গী। সকাল তক সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটা-খাটুনির পর তার আর চলার উপায় থাকে না, দিনের পর দিন গায়ের মাঁস শুকিয়ে যায়- 'মাগো, হামার বিহা দিঁয়ে দিলি গলায় ফাঁস'। বিটি বিয়ে দিয়ে বাপের এতই দুঃসহনীয় অবস্থা হয়ে যায় যে, খিদের জ্বালায় পেটে একপাট হাঁড়িয়া না হলে মদ ঢেলে নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকাই একমাত্র সম্বল হয়ে ওঠে। ভখা পেটে গুঁদলু ঘাঁটা খেয়ে, ছিঁড়াফাটা প্যান্ট পরে, বাবোই ঘাস কেটে জীবন কাটিয়ে দিয়ে, শেষতক রাজনীতির ছলচাতুরীতে সব হারিয়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে বিনা টিকিটে শিয়ালের পারা একসঙ্গে কলকাতা গিয়েও কোন লাভ হয় না, তখনও সৈকতের সেই চিরন্তন আশ্বাসবাণী,

"ভট পরবে দমতক লাচি সৈকত দাদায় বলে ছাড়িস না পাটি
আকালে বরুং বহুবিটি ছাড়া ভাল।।"[৬]

নিদারুণ দুঃখ-কষ্টে বাড়ির একমাত্র মেয়েকে বিকে দিয়েও মা-বাবা শান্তিতে থাকতে পারে না, কারণ আকালে সবারই একই অবস্থা। তার উপর রয়েছে কারণে-অকারণে শাশুড়ী-ননদের ঝাঁকিয়ে ওঠা, যা মরদটি দেখেও না দেখার ভান করে মজা লোটে। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর সে আর বছর ঘুরে গেলেও বাপের ঘরে আসতে পারে না, এটাই সংসারের চিরাচরিত রীতি। এক কাপড়ে বছর কাটিয়ে দিয়ে, ভোর থেকে রাত পর্যন্ত খেটে-খুটে, ছাগল-ভেঁড়ির সঙ্গে চড়ে বেড়াতে বেড়াতে পেটের খিদে পেটেই মরে যায়; তবুও শ্বশুরবাড়ির মন পাওয়া তার এ জন্মে আর হয়ে ওঠে না,

"সৃজন মেলায় দেখা হলে সৈকত দাদা শুনে বলে
মানুইষ এমন নিঠুর জানা নাই।। এক কাপড়ে ..."[৭]

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমমঞ্জরীর অনুসঙ্গে লোকায়ত নারীর কামনা-বাসনার অনুসঙ্গে অবাধ বিচ্ছুরণ–

পুরুলিয়ার আদিবাসী নারীদের কাছে ঝুমুর তাদের জীবন, রক্তস্রোত, হৃদয়ের হৃদস্পন্দন। সমাজ ও সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, অবসর-বিনোদন, প্রেম-বিরহ, আশা-নিরাশা, ভাব বিনিময়, সংগ্রাম ও প্রতিবাদে প্রধান উপায়-অবলম্বন হাতিয়ার। লেখক নিজেই বলেছেন,

> "সিঁদূরে কাজলে উপন্যাসে ঝুমুরের অমোঘ আকর্ষণ এবং তার দরুণ অনিবার্য পরিণতি নিয়ে ধ্বংসের সেই রাগ এর বিস্তার ঘটানোর প্রয়াস করেছি।"[৮]

লৌকিক ঝুমুরের প্রধান আকর্ষণ রাধা-কৃষ্ণের প্রেম। এই প্রেমের টানে ঘর-সংসার, পরিবার-পরিজন ছেড়ে নারীরা বেড়িয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। লোকে হাজারো কুকথা-অকথা বললেও তাদের কাছে কালার প্রেম যে কী দুর্বিষহ তা বলে বোঝানো প্রায় অসম্ভব। তাকে চেয়েও না পাওয়ার যে যাতনা তাতেই সে চোখের বিষ হয়ে উঠেছে। মাধবের পিরিতি তাকে এতই বিবশ করে ফেলেছে কোন কাজে তার মন লাগে না, সারাটা দিন মাধবের কথা ভাবতে ভাবতেই কেটে যায়। পথে চলতেও তার ঔদাসীন্য ভাব, তার নজরে সকল পথই মাধবময়। মাধবকে ভালোবেসে তাকে পদে পদে যাতনা সহ্য করতে হয়। কী বশে সে এতই বশীভূত হয়ে পড়েছে তা তার নিজের পক্ষেও এখন আর জানা-বোঝা সম্ভব নয়। তার ভিখারির অবস্থা– 'সখি, ভিখারিরও গৌরব থাকে/আমার কী গৌরব বল'। ভিখারির বেশে শ্রীদরশন বিনে নিদারুণ শোকে দিনে দিনে প্রতি অঙ্গ অবস প্রায়, তবুও কোনভাবেই বঁধুকে সে ভুলতে পারে না, ভুলতে চেয়েও পদে পদে মনে ব্যথা পায়। তার যত সাজন-গোজন সবই বঁধুর তরে, বঁধুই তার সব; বঁধু ভিন্ন তার কাছে এ ঘর-সংসারের কোন অর্থ

নেই। তাই শত দুঃখ, শত কষ্ট, শত ব্যথা-বেদনা বুকে নিয়েও সে কখনো শ্যামকে ভুলে থাকতে পারে না। শ্যামই তার সব, শ্যাম বিহনে সে এতই বিষন্ন যে সংসার ভুলতে বসার আয়োজন; তাই সখির চিরন্তন সাবধান বাণী,

" একটি পানে দুটি খিলি না করিও কভু
পিরিত ভাঙলে শুকনা বাঁধে খাবে হাবুডুবু
না জানিলে ডুবসাঁতার ডাঙায় বসে থাকো
তুমার খয়ের হামার চুন..."[৯]

স্বামীর অবর্তমানে সংসার জীবনে বিপর্যস্ত নারীর নির্মম অসহায়তা–

আদিবাসী নারীরা সাধ্যমত তাদের পুরুষের সারাক্ষণের কর্মসঙ্গিনী। সবাই মিলে কাম-কাজ করে কোনরকমে খেয়ে-দেয়ে বেঁচে-বর্তে থাকে। পরিবারের সকলকে নিয়েই তাদের সুখের সংসার। এই সুখের সংসারে কোনকারণে স্বামী মারা গেলে নারীর জীবনটাই দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। পরিবারের শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ-দেওর, ছেলে-মেয়ে সকলকে নিয়ে নারীটিকেই পরতে হয় বিষম বিপদে। অভাবের সংসারে বিভিন্ন দিক থেকে অসহায়তার পাশাপাশি যেটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সেটি হলো অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাসম্পন্নদের তাদের প্রতি যৌন প্রলোভন। নারীর ইচ্ছা না থাকলেও অনেক সময় বিপর্যস্ত সংসারের দিকে তাকিয়ে তাতে সায় দিতে হয়, দিতে একপ্রকার বাধ্যই হতে হয়। 'কুশকরাত' উপন্যাসে তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

পোশাক-পরিচ্ছদের বাহুল্যহীনতা–

সৈকত রক্ষিতের সাহিত্যের পাত্রপাত্রীরা প্রায় সকলেই আদিবাসী, তাই পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে একেবারেই যত্নহীন। উপন্যাসে মেয়ে-বউদের পোশাক বলতে অন্তর্বাস ছাড়াই আটপৌরে শাড়ি বা মোটা ধক্কর শাড়ি, যা হাটুর তল থেকে শুরু করে উরুতে পাছাতে কোমড়ে জড়িয়ে সবশেষে যা অবশিষ্ট থাকে তা কাঁধের উপর দিয়ে ছুড়ে দেয়। শায়া ও ব্লাউজের তেমন চল হাড়িদের মধ্যে নেই। যাদের ব্লাউজ আছে শুধুমাত্র তারাই যখন ধাইয়ালির কাজে যায় তখন ব্লাউজটা ব্যবহার করে। 'মদনভেরি' উপন্যাসে ঘাসিদের পরিধানও অত্যন্ত নিম্নমানের। ঘাসিমেয়েরা শাড়ি-ব্লাউজে নিজেদের যতটাসম্ভব আবৃত রাখে। মেয়েদের প্রসাধন বলতে চুল আঁচড়ানো, পরিপাটি করে বিনুনি করা, খোঁপা করা ইত্যাদি। বাচ্চা ছেলেরা ছেঁড়া প্যান্ট আর মেয়েরা জোড়াতালি দেওয়া ফ্রক পড়েই ছেলেবেলা কাটিয়ে দেয়। 'শবরচরিত' গল্পে পুরুষরা একখানা মোটা ও ঠেঁটি ধুতি কোনরকমে কোমড়ে জড়িয়ে রাখে, মেয়েরাও কোনরকমে একটা শাড়িকেই সারা শরীরে জড়িয়ে রাখে। তাতে হয়তবা তাদের একটা বুক কখনো প্রকট হয়ে থাকে কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না তাদের।

প্রখর বাস্তববাদী, মানবদরদী লেখক শব্দের ছবিতে নিচুতলার মানুষদের চিত্রায়িত করতে ভালোবাসতেন, করেছেনও তাই। মানুষের কাছে যাওয়াই ছিল তাঁর প্রিয় সখ। সেটা করতে গিয়ে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল বা দলিলের প্রতি তিনি দাসখত লিখে দেননি। তাঁর একমাত্র অঙ্গীকার মানুষগুলোর প্রতি। সেই মানুষগুলি, যাঁদের কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন- ' সংসারে যারা শুধুদিলে পেলে না কিছু, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনো হিসাব নিলে না।'
এই প্রান্তিক, বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষগুলির চরিত্র সুনির্দিষ্ট আবেগ অনুভূতির সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর কথনবিশ্বে। সেদিক থেকে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল, নারী চরিত্রগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রান্তিক অসহায় নারীর যে চালচিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা অত্যন্ত অভিনব ও বিশেষ তাৎপর্যের দাবি রাখে, গল্পকারের মানবিকতার উত্তুঙ্গ স্পর্শে তারা চিরকালীন।

তথ্যসূত্র :

১. রক্ষিত, সৈকত, 'ধুলা উড়ানি', প্রমা, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১২৫

২. রক্ষিত, সৈকত, 'কুশকরাত', সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৮৭
৩. রক্ষিত, সৈকত, 'হাড়িক', শিল্প সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৫২
৪. রক্ষিত, সৈকত, 'কুশকরাত', সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৬৫
৫. তদেব, পৃ. ১২৪
৬. রক্ষিত, সৈকত, 'হামরা পুরুলিয়াবাসী', পুরুলিয়া সংস্কৃতি কেন্দ্র, পুরুলিয়া, ২০০৫, পৃ. ৪
৭. রক্ষিত, সৈকত, 'জঙ্গল মহলের গান', বিজল্প প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৩
৮. পলমল, অরূপ, 'কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত', ডাভ্ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২৭
৯. রক্ষিত, সৈকত, 'জঙ্গল মহলের গান', বিজল্প প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৩৩

সহায়ক গ্রন্থ :

ক. সহায়ক গ্রন্থ :

১. অরূপ পলমল, 'কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত', ডাভ্ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ২০১৩
২. জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ, 'মেদিনীপুর', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, মধুসূদন মঞ্চ, কলকাতা, ২০০২
৩. ড. মিতা ঘোষ বক্সি, 'পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি', অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০
৪. ড. সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭
৫. তরুণদেব ভট্টাচার্য, 'পুরুলিয়া', ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৯
৬. দীপঙ্কর মল্লিক, 'লোকায়ত সংস্কৃতি তত্ত্বে ও সাহিত্যে', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৬
৭. বরুণকুমার চক্রবর্তী, 'লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৩
৮. বীতশোক ভট্টাচার্য, 'বাংলা উপন্যাস সমীক্ষা', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৮
৯. মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'গোষ্ঠী জীবনের উপন্যাস', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৯
১০. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, 'শতাব্দী শেষের গল্প', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা বইমেলা, ২০০১

খ. সহায়ক পত্র-পত্রিকা :

১. তাপস ভৌমিক, 'কোরক', এই সময়ের অন্য ধারার উপন্যাস, প্রাক শারদ সংখ্যা, কলকাতা, ১৪১৫
২. নিলয় ঘোষ, 'পশ্চিমবঙ্গ', পুরুলিয়া জেলা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাত, ২০০৭
৩. রমা মণ্ডল, 'দিল্লী এক্সপ্রেস', সৈকত রক্ষিত বিশেষ সংখ্যা, আমলাপাড়া, বনগাঁ, ১৯১৬
৪. লক্ষণ কর্মকার, 'সৃজন', সৈকত রক্ষিত বিশেষ সংখ্যা, সৃজন প্রকাশনী, মেদিনীপুর, ২০১৩